ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৭ম সংখ্যা, আশ্বিন ১৪২৯

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস: বিষয়ভাবনার বিবর্তন

*জাকিয়া রহমান

সারসংক্ষেপ: মধ্যবিত্তমানস ও জীবনযন্ত্রণার স্বরূপ উন্মোচনে এবং অন্তস্পর্শী কাহিনি ও চরিত্র নির্মাণে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়(১৯০৮-১৯৫৬) এক স্বতন্ত্র ভুবনের রূপকার। বাংলা কথাসাহিত্যের কালজয়ী লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে বিষয়ভাবনার বিবর্তন ঘটেছে মূলত মার্কসবাদী দীক্ষা নেওয়ার পরে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সকল উপন্যাস অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণে পরিলক্ষিত হয় উপন্যাসের বিষয়ভাবনার বিবর্তনের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে বিজ্ঞানী ফ্রয়েডের লিবিডো তত্ত্ব এবং মার্ক্সবাদী সাহিত্যতত্ত্বের প্রয়োগ ও সমন্বয়। প্রথম ধারার উপন্যাসগুলোতে নিম্নজীবী মানুষের অভাব দারিদ্র্যের হাহাকার থাকলেও এসকল চরিত্রে শ্রেণিচেতনা উপলব্ধ হয়ে ওঠে না। মার্ক্সবাদী দীক্ষায় দীক্ষিত হওয়ার কিছুটা আগে থেকে পরবর্তীসময়ে রচিত সকল উপন্যাসে লেখকের শ্রেণিচেতনা প্রবলরূপে আত্মপ্রকাশ লাভ করেছে। দ্বিতীয় পর্বের রচনায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তীব্রভাবে অনুধাবন করেছিলেন লিবিডো তত্ত্ব এবং শ্রেণিচেতনা বা অস্তিত্বের সংগ্রামের সমন্বয়ের মাধ্যমেই চরিত্রের সম্পূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সম্ভব। মধ্যবিত্ত মুখোশ আবৃত জীবনে হাঁপিয়ে ওঠা কতিপয় চরিত্র কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্রেণির উপন্যাসে যেন নিজের অবস্থানের বিপক্ষে বিদ্রোহ করেছে। নিম্নবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত, এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবনকেন্দ্রিক তথা তাদের অন্তরের অন্তঃস্তলে রক্ষিত অপ্রকাশ্য হাহাকার ও সংকট, অপ্রাপ্তি ও অতৃপ্তি, যাতনা ও বেদনা প্রকাশ্যে এনে উপন্যাস রচনায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সমীক্ষাধর্মী অনবদ্য এক কথার জাদুকর।

১৯৪৭ সালের দেশভাগের পূর্বে বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা এক কথাশিল্পীর নাম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)। পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতা নীরদা সুন্দরী দেবী। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতৃপ্রদত্ত নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । গায়ের রং কালো হওয়ায় সবাই তাকে কালা মানিক বলেই ডাকত। উচ্চশিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ পিতার সন্তান মানিক বাল্যকাল থেকেই ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী, বিচক্ষণ, সাহসী ও প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন। এই বুদ্ধি-বিচক্ষণতা ও সাহসের সংমিশ্রণেই তিনি সহপাঠীদের সাথে বাজি ধরেন এবং 'অতসীমামী' গল্প রচনা করে তা বিখ্যাত 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশ করতে সক্ষম হন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নাম ধারণ করে বাংলা সাহিত্যের আসরে প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সগর্বে প্রবেশ করলেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নামে লেখক পরিচিতির কারণে এ নামটি বাংলা কথাসাহিত্যের জঠরে স্বর্ণাক্ষরে রক্ষিত হয়েছে। পরবর্তীকালে তিনি রচনা করেছেন একের পর এক কালজয়ী উপন্যাস, গল্প ও প্রবন্ধ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতের যাদুস্পর্শে বাংলা কথাসাহিত্যে প্রায় ৪০টি উপন্যাস এবং ৩০০টির মতো গল্প ও অসংখ্য প্রবন্ধ সংযোজিত হয়েছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিরলপ্রজ বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী অসামান্য কথাসাহিত্যিক। তিনি লেখক জীবনের প্রতি এতটাই আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে লেখার প্রয়োজনে প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা মাঝপথে বন্ধ করে দেন এবং বাংলা সাহিত্য সাধনায় একাগ্রচিত্তে মনোনিবেশ করেন। তাঁর সাহিত্যে মূলত স্থান পেয়েছে মধ্যবিত্ত সমাজের জীবনযন্ত্রণা, সংগ্রাম, নিয়তিবাদ ও নীতিবাদ।

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী কোর্ট কলেজ, রাজশাহী

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা সদ্য কাটিয়ে ওঠা মানুষের জীবনের নানা সংঘাত ও সমস্যাকে তিনি সাহিত্যের বিষয় করেছেন। মাত্র ৪৮ বছরের সাহিত্যসাধনায় নিজেকে মানুষের প্রয়োজনে নিয়োজিত রেখেছেন। মানুষের মনোদৈহিক জটিলতার উৎস সন্ধানে বিজ্ঞানী ফ্রয়েড দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। আরো পরিণত বয়সে তিনি গভীরভাবে অনুধাবন করেছেন মানুষের মূল সমস্যা। অর্থাৎ হীনতা ও দীনতাই জীবনের সার্বিক সমস্যার জন্য দায়ী। নিবিষ্ট চিত্তে অনুভব করেছেন এ সকল সমস্যার মূলে রয়েছে সীমাহীন অর্থনৈতিক বৈষম্য ও শোষণ।

ধনতান্ত্রিক বুর্জোয়া সমাজের ক্রমাগত শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন। সঙ্গত কারণেই তিনি ভারতীয় রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন এবং মার্কসবাদী শ্রেণিসংগ্রাম তত্ত্ব দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হন। "এই চেতনার ছাপে কমিউনিস্ট পার্টিতে মানিকের যোগদান অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে এবং ১৯৪৪ সালের শেষের দিকে মানিক সক্রিয়ভাবে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন।"[১] মানসপটে মার্কসবাদী শ্রেণিসংগ্রামের প্রভাব এবং বাস্তবে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানের পরবর্তীকালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিজীবনের প্লট পরিবর্তিত হয়েছে। ব্যক্তিজীবনের এ পরিবর্তন মারাত্মকভাবে প্রভাব ফেলেছে তাঁর লেখনিতে। "জীবনকে জীবনের মতো উপন্যাসে প্রতীয়মান করানোর অনুজ্ঞা ঔপন্যাসিককে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হয়। এরই অপর নাম বাস্তব এবং জীবনের মায়া (illusion) সৃজন।"[২] প্রথম পর্যায়ের উপন্যাসগুলোর বিষয়বস্তুর মাঝে বাঙালি সামাজিক জীবনের সীমাহীন জটিলতা, নিয়ত টানাপোড়েন ও মানুষের মনস্তাত্ত্বিক বৈচিত্র্য প্রাধান্য পেয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করার কিছু পূর্ব সময় থেকে পরবর্তীসময়ের উপন্যাসে তিনি মার্কসবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। "এরই পাশাপাশি প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিপন্ন পরিস্থিতির ফলে সৃষ্ট শূন্যতাবোধ, অনিকেত চেতনা, প্রচলিত মূল্যবোধ, নিরাপত্তাহীনতা প্রভৃতি অনুষঙ্গও তার জীবনবোধে সংশ্লিষ্ট রয়েছে।"[৩] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম পর্বের উপন্যাসে ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণের অতিশয় প্রভাব থাকলেও সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণ সম্পর্কে মানিকের লেখকসত্তা সর্বদা সজাগ ছিল।

পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের চেতন-অবচেতন মনের স্বরূপ উদঘাটনের পাশাপাশি জেলেপাড়ার নিরীহ ধীবরদের জীবনাচরণ অকৃত্তিমভাবে লেখক ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথম পর্বের উপন্যাসে মার্কসীয় শোষণের চিত্র তুলে ধরলেও সেখানে বিদ্রোহ বা বিক্ষোভের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় না। "মার্কসীয় সমাজতত্ত্বে আস্থাশীল হওয়ার পর মানিকের মধ্যে মুক্তির পথ সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট চেতনা সৃষ্টি হয়। মানিক এই উপলব্ধিতে পৌঁছেন: শোষিত-বঞ্চিতজনদের সমষ্টিবদ্ধ আন্দোলন- সংগ্রাম- বিক্ষোভের মধ্যে তাদের মুক্তি নিহিত।"[৪] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উপন্যাসগুলোর মধ্যে রয়েছে-

জননী (১৯৩৫), *দিবারাত্রির কাব্য* (১৯৩৫), *পুতুলনাচের ইতিকথা* (১৯৩৬), *পদ্মানদীর মাঝি* (১৯৩৬), *জীবনের জটিলতা* (১৯৩৬), *অমৃতস্য পুত্রাঃ* (১৯৩৮), *সহরতলী* (প্রথম পর্ব, ১৯৪০), *অহিংসা* (১৯৪১), *সহরতলী* (দ্বিতীয় পর্ব, ১৯৪১), *চতুষ্কোণ* (১৯৪৮), *ধরাবাঁধা জীবন* (১৯৪১), *প্রতিবিম্ব* (১৯৪৩), *দর্পণ* (১৯৪৫), *সহরবাসের ইতিকথা* (১৯৪৬), *চিন্তামণি* (১৯৪৬), *চিহ্ন* (১৯৪৭), *আদায়ের ইতিহাস* (১৯৪৭), *জীয়ন্ত* (১৯৫০), *পেশা* (১৯৫১), *সোনার চেয়ে দামি* (প্রথম খণ্ড/বেকার, ১৯৫১), *স্বাধীনতার স্বাদ* (১৯৫১),

ছন্দপতন (১৯৫১), *সোনার চেয়ে দামি* (দ্বিতীয় খণ্ড/আপোষ, ১৯৫২), *ইতিকথার পরের কথা* (১৯৫৯), *পাশাপাশি* (১৯৫২), *সর্বজনীন* (১৯৫৩), *নাগপাশ* (১৯৫৩), *আরোগ্য* (১৯৫৩), *চালচলন* (১৯৫৩), *২৩ বছর আগে পরে* (১৯৫৩), *হরফ* (১৯৫৫), *শুভাশুভ* (১৯৫৪), *পরাধীন প্রেম* (১৯৫৫), *হলুদ নদী সবুজ বন* (১৯৫৬), *মাশুল* (১৯৫৬), *প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান* (১৯৫৬), *মাটিঘেষা মানুষ* (১৯৫৭), *মাঝির ছেলে* (১৯৬০) ও *শান্তিলতা* (১৯৬০)।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উপন্যাসসমূহের মধ্যে *পুতুলনাচের ইতিকথা* ও *পদ্মানদীর মাঝি* সর্বাধিক পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এ উপন্যাস দুইটি বহুভাষায় অনূদিত হয়েছে। লেখকের ব্যক্তিজীবনের বাঁক পরিবর্তন ঘটেছে মূলত মার্কসীয় সমাজতাত্ত্বিক মতবাদের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার পরে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিজীবন ও সমাজ জীবনের এই বাঁক-পরিবর্তনের প্রবল ছায়াপাত তাঁর সাহিত্যচর্চায় লক্ষ করা যায়। সঙ্গত কারণেই পরিণত বয়সে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রথমদিকের রচনার মাঝে শূন্যতা অনুভব করেন। গভীর নিবিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিতে ১৯৪০ সালের পূর্ববর্তী এবং ১৯৪০ সালের পরবর্তী কতিপয় উপন্যাস বিশ্লেষণে তাঁর রচনায় বিষয়ভাবনার বিবর্তন উপলব্ধ হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৪ সালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করলেও তাঁর চেতনায় মানুষে মানুষে শ্রেণিভেদ-পারস্পরিক শোষণ-পীড়ন ঝড় তুলেছে ১৯৪৪ সালের পূর্বেই। মার্কসীয় দর্শনের সংস্পর্শে লেখক মনের অন্তঃগভীরে রক্ষিত সীমাহীন ক্ষোভ ক্রমে পরিণতি লাভ করেছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস *জননী* ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত। উপন্যাসের মুখ্য বিষয় নারীর জননী তথা মাতৃরূপ। জননী উপন্যাসটিকে নারীর চিরায়ত মাতৃরূপের জীবনালেক্ষ্য বলাই সমীচীন। উপন্যাসের নায়িকা শ্যামার মা হওয়ার মধ্য দিয়ে কাহিনির সূচনা। এ উপন্যাসে নারী চরিত্রের অস্তিত্ববান হয়ে ওঠার মূলে রয়েছে তাদের মাতৃত্বচেতনা। "সন্তান প্রসবের পর হইতে জননীর জীবনারম্ভ। কাজেই শ্যামার প্রথম দুটি সন্তানের জন্মে তাহার মানস- প্রতিক্রিয়া সূক্ষ্ম ও বিস্তৃতভাবে বর্ধিত হয়েছে।"[৫] শীতলের সাথে বিয়ের পরে থেকেই অত্যাচারী অবিবেচক স্বামীর মাত্রাতিরিক্ত স্বামীত্বের পীড়নে শ্যামা ঝিমিয়ে পড়েছিল। মুখ বুজে সহ্য করেছে সকল অনাচার, অত্যাচার। মাতৃত্বের শক্তি শ্যামার আত্মোন্নয়ন ঘটায়। মুহূর্তে সে শীতলকে পরিচালনা করার মনোবলসম্পন্ন এক নারী হয়ে ওঠে। উপন্যাসে শ্যামার অস্তিত্ববাদী হয়ে ওঠায় অর্থাৎ শ্যামার অস্তিত্বের স্বরূপ উন্মোচন করে লেখক নারীর মাতৃরূপের মহিমা প্রকাশ করেছেন।

বিয়ের দীর্ঘদিন পরে জন্ম নেয়া শ্যামার প্রথম সন্তান মাত্র বারো দিন জীবিত থাকে। সন্তান মৃত্যুর কারণ হিসেবে নিজের দায়িত্বহীনতাকে দায়ী করে শ্যামা। সন্তানহারা শ্যমার মাতৃমনে এই ঘটনা গভীরভাবে দাগ কেটে যায়। পরবর্তীসন্তান জন্ম নেওয়ার পরে থেকেই সে হয়ে ওঠে অতিসতর্ক। শ্যামার মাতৃত্বের কাছে সংসারে শীতলের চোখরাঙানিসহ সকল অত্যাচার তুচ্ছ হয়ে যায়। প্রথম সন্তান হারানোর ভয় মনে নিয়ে সদা শঙ্কিত মাতা শ্যামা। পরবর্তীসন্তান বিধানকে সুস্থভাবে বড় করতে রাত দিনকে এক করে ফেলে শ্যামা। এমনি সময়ে মনে মনে অর্থাৎ মনোভাবনাতেও কোনো প্রকার অপরাধকে সে প্রশ্রয় দেয় না। ভয় পায় এই ভেবে যে ওই অপরাধের কারণে যদি পুত্রের অকল্যাণ হয়। শিশুকাল থেকে শুরু করে বিধানের স্কুল গমনের দিন বাঙালি মায়ের বিভিন্ন আচার পালনের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় শ্যামার মাতৃত্বের

অনন্য রূপ। ননদ মন্দার প্রতি শ্যামার সহানুভূতির কারণও এই মাতৃত্ব। বিধানের অতি সুন্দরী তরুণী চটপটে বধু শ্যামার ঈর্ষার কারণ হয়ে ওঠে। "তবে বাৎসল্যজনিত ঈর্ষা ও সেই সূত্রে বিদ্বেষ এবং তজ্জাত শ্যামার নিমজ্জিত অস্তিত্ব এই সবকিছু থেকে তার মুক্তি ঘটে নববধূর সন্তান সম্ভাবনায়।" [৬] উপন্যাসে শ্যামার জননী রূপের আচ্ছাদনে ঢাকা আর সকল বিষয়। বাঙালি নারীর সন্তান, সংসার কেন্দ্রিক সামাজিক জীবনের গতিশীল চিত্র জননী উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে। একই সাথে সবচাইতে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে নারীর মাতৃরূপ।

সমসাময়িক সময়ে প্রকাশিত *দিবারাত্রির কাব্য* উপন্যাসে নারী পুরুষের মনের বিচিত্র কামনা-বাসনা ও সংসার জীবনের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার মনস্তাত্ত্বিক দূরত্বের চিত্র তুলে ধরেছেন লেখক। *দিবারাত্রির কাব্য* উপন্যাসে তিনটি নারী চরিত্র যথাক্রমে সুপ্রিয়া, মালতি ও আনন্দ এবং তিনটি পুরুষচরিত্রের প্রাধান্য রয়েছে। তিনটি পুরুষচরিত্রের মধ্যে রয়েছে সুপ্রিয়ার স্বামী অশোক, মালতির স্বামী অনাথ এবং হেরম্ব। হেরম্ব মাত্র বারো বৎসর বয়সে তার অপেক্ষা বেশি বয়সী মালতির প্রেমে পড়ে। হেরম্বের প্রতি সুপ্রিয়ার প্রেমাকাঙ্ক্ষা রয়েছে বাল্যকাল থেকে। মালতি তার প্রেমিক অনাথকে বিয়ে করে ঘর ছাড়ে। লেখক এমনই এক জটিল সম্পর্কের জাল বুনেছেন দিবারাত্রির কাব্য উপন্যাসে। দীর্ঘদিন পরে হেরম্ব মালতির সাথে দেখা করতে গিয়ে মালতির মেয়ে আনন্দের সাথে পরিচিত হয়। এ অবস্থায় অধ্যাপক হেরম্ব বিপত্নীক ছিলেন।

সদ্যযৌবনা অষ্টাদশী আনন্দের দৈহিক সৌন্দর্যে হেরম্ব মালতির ছেলেবেলার সেই রূপ খুঁজে পায়। আনন্দের রূপে মালতির রূপের সেই মুগ্ধতা, সেই সৌন্দর্য হেরম্বের মনকে আবারো আচ্ছন্ন করে। অর্থাৎ হেরম্বের কিশোর বয়সে মালতির রূপের প্রতি যে মোহাচ্ছন্নতা তা তখনোবধি তার হৃদয়ে সুরক্ষিত ছিল। হেরম্ব বিপত্নীক অধ্যাপক হওয়ায় মালতি আনন্দের সঙ্গে হেরম্বের বিয়ের প্রত্যাশায় একান্তে ঘনিষ্ঠভাবে মেশার সুযোগও দিয়েছে। আনন্দের বোধক্ষমতা হবার অর্থাৎ একটু বড় হওয়ার পরেই আত্মিকভাবে অনুধাবন করেছে তার বাবা ও মায়ের দাম্পত্য সম্পর্কের দূরত্ব। মালতি ভালোবাসে অনাথকে কিন্তু অনাথ সর্বপ্রকারে মালতিকে অবজ্ঞা করে। মালতি ও অনাথের ভালোবাসা বিহীন শুধু অভ্যাসবশত চালিয়ে যাওয়া দাম্পত্য সম্পর্কের মাঝে আনন্দ সর্বদা শংকিত থেকেছে। আনন্দের অভিমত -"মা-বাবাকে ভয়ানক ভালোবাসে। বাবা যদি দুদিনের জন্যও কোথাও চলে যান, মা ভেবে ভেবে ঠিক পাগলের মতো হয়ে থাকে। বাবা কিন্তু মাকে দু'চোখে দেখতে পারে না। আমার জ্ঞান হবার পর থেকে একদিন বাবাকে একটি মিষ্টি কথা বলতে শুনি নি।"[৭] স্বামীর ক্রমাগত অবহেলায় মালতি মদ্যপান শুরু করে। মায়ের অসীম মনঃকষ্টে আনন্দের মনে হয়- "নিষ্ঠুর ? ভয়ানক নিষ্ঠুর। আজ বাবার কাছে একটু ভালো ব্যবহার পেলে মা মদ ছোঁয় না। জেনেও বাবা উদাসীন হয়ে আছেন। এক এক সময় আমার মনে হয়, এর চেয়ে বাবা যদি কোথাও চলে যেতেন তাও ভালো ছিলো। মা বোধহয় তাহলে শান্তি পেত।"[৮] নিজের জীবন ও সংসারকে আনন্দ তার মায়ের মতো ভালোবাসা বিহীন ভাবতেই পারে না। আনন্দের নিরানন্দ জীবনের শেষ স্বপ্ন ছিল নিজের সঙ্গীর ভালোবাসা পাওয়া। হেরম্বের প্রথম স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা হীনতায় প্রথম আঘাত পায় আনন্দ। হেরম্বেরও স্ত্রীর প্রতি একই আচরণে সে শঙ্কিত হয়ে পড়ে।

হেরম্ব যখন আনন্দকে জানায় যে ভালোবাসা বেঁচে থাকে একদিন, দুই দিন অথবা সাতদিন; এমনকি সর্বোচ্চ এক মাস। একথা জানার পরেই আনন্দের হৃদয় জুড়ে অস্তিত্বহীন চেতনা ও

তীব্র মনঃকষ্টের ঝড় ওঠে। হেরম্বের প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন- "তাহার জীর্ণাবশিষ্ট যৌবন ও অর্ধমৃত প্রেম লইয়া সে আনন্দের মনের প্রথম বসন্তোৎসবের সঙ্গে নিজেকে মিলাইতে অক্ষম হইয়াছে।"[৯] সুপ্রিয়ার সাথে হেরম্বের প্রণয় অনুধাবনেও ঈর্ষান্বিত, মানসিক বিপর্যস্ত, উন্মূল হয় আনন্দের জীবনচেতনা। হেরম্বের আশ্রয়ে আনন্দকে রেখে মালতি গৃহ ত্যাগ করলে, একাকী আনন্দের মনোভুবন এক ভয়ানক বিষণ্ণতায় নিমজ্জিত হয়েছে। চিরবুভুক্ষু ভালোবাসার প্রত্যাশী আনন্দের ভগ্নহৃদয় উদ্ভ্রান্ত চিন্তায় জড়িয়ে অনেকটা বিকারগ্রস্ত ও নিরানন্দে পরিণত হয় আনন্দের জীবনচেতনা। এ পর্যায়ে হতাশাগ্রস্ত আনন্দ সঙ্গীর হৃদয়ে নিজেকে চিরস্থায়ী করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। হেরম্বের কথানুযায়ী পথ অনুসরণে আনন্দ আত্মহনন বা স্বেচ্ছামৃত্যুকে বরণ করে নেয়। হেরম্বের মতে পারস্পরিক ভালোবাসা থাকা অবস্থায় অর্থাৎ একমাস সময়ের মধ্যে সংঘটিত মৃত্যু এবং এ মৃত্যুর বিরহ, ভালোবাসাকে চিরস্থায়ী করে। জীবিতাবস্থায় এ ভালোবাসার স্থায়িত্ব সর্বোচ্চ এক মাসের বেশি হয় না। আবেগপ্রবণ আনন্দ তার প্রেমাস্পদ হেরম্বের হৃদয়ে নিজেকে চিরস্থায়ী করতে চেয়েছে যা প্রতিটি নারীর অস্ফুট বাসনার পরিচায়ক। জীবন সম্পর্কে আশাহত আনন্দ হেরম্বের সম্মুখে নৃত্যরত অবস্থায় জ্বলন্ত আগুনে নিজেকে নিঃশেষ করে। আত্মহুতি দিয়ে জীবনের সমাপ্তি টেনেছে আনন্দ। আত্মাহুতির মাধ্যমে আত্মত্যাগে আনন্দ নামটি পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হলেও আনন্দের চিরবুভুক্ষু হৃদয়ের বাসনা পূরণ হওয়ার সমূহ বিশ্বাস বুকে নিয়ে আনন্দ আগুনে ঝাঁপ দিয়েছে। প্রেমিকের হৃদয়ে চিরস্থায়ী হয়ে থাকার বাসনা তাকে উদভ্রান্ত করেছিল।

দিবারাত্রির কাব্য উপন্যাসে হেরম্ব কামুক ও কৌশলী চরিত্ররূপে নারীর সংস্পর্শকে পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করেছে মাত্র। হয়ত বিপত্নীক অবস্থায় সচেতনভাবে কোন নারীর দায়িত্ব নিতে চায় নি। সঙ্গত কারণেই আনন্দকে আঁকড়ে ধরে নি। একইভাবে সুপ্রিয়ার ভালোবাসাকে স্বীকৃতি দেয় নি কিন্তু উসকে দিয়েছে। তাকে কখনো প্রবলভাবে বাধা দেয়নি। হেরম্বের অপরিণত বয়সের প্রেম ও প্রেয়সি মালতি। মালতিকে না পেয়ে তারই আত্মজা আনন্দকে অধিকার করতে চেয়েছে। ফ্রয়েডীয় মনোবীক্ষণে সমাকীর্ণ এ চরিত্র প্রবল লিবিডো তাড়নায় তাড়িত। কন্যা তুল্য আনন্দকে তার কন্যা মনে হয় না। আনন্দ তার চোখে শুধুই একজন রমণী। বিবেক বর্জিত, কামসর্বস্ব পুরুষের চোখে সকল বয়সের নারী রমণী রূপেই প্রতিভাত হয়ে উঠে। স্ত্রী বিয়োগে দীর্ঘ নারীসঙ্গ বিহীন উদ্ভ্রান্ত জীবনে যেন সংযম চেষ্টা বা কন্যা তুল্যাকে কন্যা ভাবার অভিপ্রায় হেরম্বের হয়ে উঠেনি। কন্যা তুল্য আনন্দের কাছে সহজ স্বীকারোক্তিতে বলেছে-"তোমায় দেখে কার লোভ হবে না, আনন্দ? আমারও হয়েছিল।"[১০] আনন্দের শারীরিক সৌন্দর্য হেরম্বের মনে তার প্রতি প্রবল আসক্তি সৃষ্টি করেছে। হেরম্বের মনে আনন্দের শরীর অধিকারের লোভ ও সীমাহীন আসক্তির সঙ্গে ভালোবাসার আকর মিশেছে। আনন্দ তা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে। নিমজ্জিত হতাশায় ক্রমশ তার জীবনীশক্তির ক্ষয় হয়েছে। এই উপন্যাসে নারী ও পুরুষ চরিত্রের পারস্পরিক বোঝাপড়া ও মানসিক দ্বন্দ্ব রয়েছে। ফ্রয়েডের জটিল মনোবীক্ষণই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ফুটিয়ে তুলেছেন *দিবারাত্রির কাব্য* উপন্যাসে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *জননী* এবং *দিবারাত্রির কাব্য* উপন্যাস অপেক্ষা পরবর্তী মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস *পুতুলনাচের ইতিকথা* (১৯৩৬) অধিক জনপ্রিয়তা পায়। *পুতুলনাচের ইতিকথা* উপন্যাসের ফ্রয়েডীয় মনস্তাত্ত্বিকতার সাথে যুক্ত হয়েছে পাশ্চাত্য নিয়তিবাদ। "মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনবোধ, সমাজচেতনা ও বিজ্ঞানমনস্কতার এক পরিপূর্ণ মিথস্ক্রিয়া হচ্ছে

পুতুলনাচের ইতিকথা।"[১১] *পুতুলনাচের ইতিকথা* উপন্যাসের নায়ক শশী, নায়িকা পরানের স্ত্রী কুসুম। উপন্যাসের দুটি চরিত্রের পাশাপাশি দেখা মেলে মতি, কুমুদ, যামিনী কবিরাজ, সেনদিদি, শশীর পিতা গোপাল, শশীর বোন বিন্দু ও বিন্দুর স্বামী নন্দলাল, সূর্য বিজ্ঞানের পণ্ডিত যাদব পণ্ডিত। এ সকল চরিত্রের বিভিন্ন কার্যকলাপে ও কাহিনির গতিশীলতায় উপন্যাসের অন্তর্নিহিত বিষয়ভাবনা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

উপন্যাসের সূচনা গাওদিয়া গ্রামে প্রবীণ ব্যক্তি হারু ঘোষের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। হারু ঘোষের পুত্র পরানের তেইশ বছর বয়সের নিঃসন্তান স্ত্রী কুসুম। কুসুম বড় ঘরের মেয়ে। পরানের ঘরে কুসুমের সীমাহীন দাপটের কারণ তার বাবার অঢেল অর্থ-সম্পদ। কুসুম পূর্ণযৌবনা তরুণী ও উচ্চ রুচিবোধসম্পন্ন এক নারী। সঙ্গত কারণেই সাদাসিধে স্বামী পরানের নীরস অশিক্ষিত আচরণ তার মনের দুর্জ্ঞেয় রহস্য ভেদ করতে পারে না। কল্পনা বিলাসী কুসুম আকৃষ্ট হয় পরানের বন্ধু তুল্য কলকাতা ফেরত সদ্য পাশ করা ডাক্তার শশীর প্রতি। শশী চরিত্র বিশ্লেষণে পরিলক্ষিত হয় এ চরিত্রে সংযোজিত হয়েছে বুদ্ধির প্রখরতা, সম্পত্তির মোহ, আবেগ, সৌন্দর্যচেতনা এবং মানবকল্যাণের বিষয় ও উচ্চমার্গীয় রুচিশীল মানসচেতনা। শশী চরিত্রের এ বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি এই চরিত্রটিকে অতিমাত্রায় পরিণত ও আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করেছে। কুসুমের হৃদয়কথন শশী অনুধাবন করে তার উন্মত্ত প্রেম উপভোগ করেছে মাত্র। কুসুমকে অর্থাৎ বন্ধুপত্নীকে তার প্রতি আসক্তিতে বাধা দেয়নি। বরঞ্চ নীরব থাকার মাধ্যমে উসকে দিয়েছে কুসুমের মন। দীর্ঘ নয় বছর ভালোবাসা প্রাপ্তির নতুন আশায় বুকবেঁধে কুসুম বারবার ছুটে গেছে শশীর কাছে। নানা বাহানা ও অজুহাতে শশীকে একনজর দেখতে এবং কাছে পেতে চেয়েছে। একটু কথা বলার আশায় শশীর পিছু নিয়েছে। অনর্গল শশীর কাছে অকপটে মিথ্যা কথা বলে গেছে। প্রকৃতপক্ষে শশী চরিত্রের আকর্ষণ শক্তি কুসুমকে সমূলে কাছে টেনেছে। ভরদুপুরে এমনকি ভরা সন্ধ্যাবেলাতেও কুসুম ঘরে থাকতে পারেনি। স্বামী-সংসার, লোকভয় সকলকিছু উপেক্ষা করে শশীর সান্নিধ্য লাভের বাসনায় বারবার ছুটে গেছে। শশীর পক্ষ থেকে আশানুরূপ সাড়া না পাওয়ায় বারবার আশাহত হয়ে ফিরে গেছে। মনঃকষ্টে বারবার আহত হয়েছে কুসুম। "আমাদের এই কিম্ভূতকিমাকার গঠনের ঔপনিবেশিক জীবনে কলকাতা এবং গাউদিয়ার মাঝে যে দূরতিক্রম্য ব্যবধান শশী-কুসুমের সম্পর্ক তারই প্রতীক। শশীর ফুলের চারা মাড়িয়ে কুসুমের দাঁড়ানোর মানেও এইখানে।"[১২] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুসুম ফ্রয়েডের মনোবিশ্লেষণ সম্পন্ন নারী চরিত্র। এই চরিত্রটি ফ্রয়েডের লিবিডো চেতনায় তাড়িত। কুসুম মেয়ে হয়েও লিবিডো তাড়নায় শশীর কাছে অকপটে স্বীকার করেছে-"আপনার কাছে দাঁড়ালে আমার শরীর এমন করে কেন ছোট বাবু?"[১৩] ১৯৩৬ এর সমকালের প্রেক্ষাপটে নারীর মুখে নিজের শরীরের চাহিদার স্বীকারোক্তি এ চরিত্রের দুঃসাহসিকতার পরিচয় দেয়। সাহসী লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় তিনি এমন অসংখ্য সাহসী ও দুঃসাহসিকতা সম্পন্ন চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। নিজের ভালোলাগা ও ভালোবাসা উপস্থাপনে কুসুম চরিত্রটি বাংলা সাহিত্যে অনবদ্য, অদ্বিতীয় একটি চরিত্র।

কুসুমের দৈহিক আবেদনের বিরোধিতা করে শশীর উক্তি-"শরীর! শরীর! তোমার মন নাই কুসুম?"[১৪] নারীর দৈহিক আবেদন অপেক্ষা তার মনের সন্ধান যে পুরুষ করবে সে নিঃসন্দেহে প্রকৃত প্রেমিক। শশীর এই উক্তিতে কুসুমের প্রতি তার প্রবল আকর্ষণ, হৃদয়োৎসারিত প্রকৃত

প্রেম বা ভালোবাসার গভীরতার প্রমাণ পাওয়া যায়। শুধু শরীরসর্বস্ব ভালোবাসা শশীর কাম্য ছিল না। এও সত্যি কুসুমের কোমল মনের সন্ধানও শশী পেয়েছিল। কুসুমের মন বুঝতো বলেই সে তাকে অদৃশ্য বাঁধনে বেঁধে রেখেছিল নয় বছর। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরে শশী ডাক্তারের ক্লান্ত মনও একটু আশ্রয় খুঁজেছে কুসুমের কাছে। কুসুমও হৃদয়ে ধারণ করেছে শশীর প্রতি এক অদৃশ্য টান। অবচেতন মনে শশীকে কাছে পাওয়ার তীব্র বাসনায় চেতনাবস্থায় ছুটে গিয়েছে শশীর সন্নিকটে। সময়ের বিবর্তনে শশীর অবচেতন মনে কুসুমের প্রতি তীব্র আকর্ষণ ও অপ্রতিরোধ্য ভালোবাসার জন্ম নিয়েছে। কুসুমের গ্রাম ছেড়ে চিরতরে বাবার বাড়ি চলে যাওয়ায় শশী প্রকাশ্যে আপত্তি জানায়। কুসুমের গ্রামছাড়ার সিদ্ধান্তে শশীর কষ্ট ও শূন্যতাবোধ তাকে বাধা দেওয়ার মাঝে ভালোবাসা প্রকাশে আর অস্পষ্টতা থাকে না। শশী স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে জানায় কুসুমকে নিয়ে সে পালিয়ে যেতে চায়। কুসুম নিজের ক্ষতবিক্ষত মনকে গুটিয়ে নিয়েছে। শশীর প্রেমাবেদন কুসুম সবলে অস্বীকার করে বলেছে-"লাল টকটকে করে তাতানো লোহা ফেলে রাখলে তাও আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে যায়, যায় না? সাধ আহ্লাদ আমার কিছু নেই, নিজের জন্য কোন সুখ চাই না-বাকি জীবনটা ভাত রেঁধে ঘরের লোকের সেবা করে কাটিয়ে দেবো ভেবেছি-আর কোন আশা নেই, ইচ্ছে নেই, সব ভোঁতা হয়ে গেছে ছোট বাবু। লোকের মুখে মুখে মন ভেঙে যাবার কথা শুনতাম। এতদিনে বুঝতে পেরেছি সেটা কি। কাকে ডাকছেন ছোটবাবু, কে যাবে আপনার সঙ্গে? কুসুম কি বেঁচে আছে? সে মরে গেছে।"[১৫] কুসম ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের অপ্রাপ্তিজনিত হাহাকার, হতাশা ও এক বুক জ্বালা নিয়ে গাওদিয়া গ্রাম ছেড়ে চিরতরে বাবার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে।

শশীর বাবা গোপাল পেশায় ব্যবসায়ী। গোপাল চরিত্রের মধ্য দিয়ে শোষক চরিত্রের স্বরূপ প্রকাশ পায়। গোপাল বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থার প্রতিনিধি। এই উপন্যাসে গোপাল চরিত্রটিও লিবিডো তাড়িত। সেনদিদির সাথে গড়ে তোলে অনৈতিক সম্পর্ক। উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে সদ্যবিধবা সুন্দরী সেনদিদির অন্তঃসত্ত্বা হওয়া ও এক পুত্র সন্তানের জন্মের দায় গোপালের। গোপালের সকল সম্পদের মূলে রয়েছে তার চতুরতা। বুদ্ধিকে পুঁজি করে গোপাল জমিয়েছে অঢেল অর্থ সম্পদ। তার এই সীমাহীন চতুরতার বলি হয়েছে কন্যা বিন্দুর জীবন। গোপাল কলকাতাবাসী ধনাঢ্য ব্যবসায়ী নন্দলালকে ফাঁসিয়ে তার সাথে বিন্দুর বিয়ে দেয়। নন্দলাল বিপদে পড়ে বিন্দুকে বিয়ে করতে বাধ্য হলেও বিন্দুকে স্ত্রীর মর্যাদা দেয় নি। নন্দলাল গোপালের চতুরতার প্রতিশোধ নেয় বিন্দুর উপর। বিবাহিত স্ত্রী বিন্দুকে রক্ষিতা বানিয়ে রাখে। সাঁড়াশি দিয়ে দাঁত ফাঁক করে মুখে মদ ঢেলে দিয়ে মদে অভ্যস্ত করে ফেলে। বিন্দু এমন অত্যাচারিত জীবন থেকে মুক্তি চেয়েছে প্রতিনিয়ত। কিন্তু সাত বছরের এমন রক্ষিতার জীবন অপছন্দের হলেও সে এ জীবনেই অভ্যস্ত হয়েছে। বাবার বাড়িতে আকণ্ঠ মদ্যপান করে মাতাল অবস্থায় গ্রামময় দুর্নাম রটিয়েছে। নন্দলাল বিন্দুকে মুক্তি দিতে চেয়েছিল। কিন্তু সাত বছরের আকণ্ঠ মদ্যপ জীবন অভ্যাসের মতো বিন্দুর সাথে মানিয়ে গেছে। সুস্থ স্বাভাবিক সভ্য নারীজীবনে সে আর কোনদিন ফিরতে পারে না।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পুতুলনাচের ইতিকথা* উপন্যাসের কাহিনি বিন্যাস ও চরিত্র বিন্যস্তকরণে উপন্যাসটিকে মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক উপন্যাস বলেই মনে হয়। "গাওদিয়া গ্রামের জীবনযাত্রা-প্রণালী ও বিশেষ কয়েকটি সমস্যার যে ছবি আঁকা হইয়াছে, তাহা এক হিসাবে আমাদের

সাধারণ পল্লী সমাজচিত্রেরই একটি খণ্ডাংশ।"[১৬] শশী, কুসুম, মতি, কুমুদ, বিন্দু, গোপাল, সেনদিদি, যামিনী কবিরাজ, যাদব পণ্ডিত সকল চরিত্রেই বিচিত্র মনস্তাত্ত্বিক চিত্র পরিলক্ষিত হয়।

মতির স্বপ্নলোকের রাজকুমার কুমুদ। মতির মন জুড়ে গতানুগতিক বাঙালি নারীর স্বপ্ন। স্বপ্ন ডানায় ভর করে চোখে রাজ্যের সুখস্বপ্ন নিয়ে মতি কুমুদকে বিয়ে করে। বিয়ের পরে কুমুদ জানায় মতি তার বউ নয়, তার পথচলার সাথি। সংসার, সন্তান নিয়ে গতানুগতিক বউ হতে চাইলে মতির সঙ্গে কুমুদের পথচলা অসম্ভব। মতিও বিন্দুর মতো স্বামীর ইচ্ছাশক্তির কাছে বন্দি-বিমর্ষ, নির্মম-যন্ত্রণাময় জীবন কাটিয়েছে। "বিবাহিত জীবনে এরূপ Bohemianism বা উৎশৃঙ্খল যাযাবর জীবনচিত্র বঙ্গসাহিত্যে আর নাই। কুমুদের প্রণয়ের মধ্যে এমন একটা অস্থিরতা, একটা নির্লিপ্ততা ও ঔদাসীন্যের আস্তরণ আছে যাহাতে নবপরিণীতা বধূর নির্ভর-প্রয়োজনীয় তৃপ্তি হইতে পারে না। বিবাহের মতো একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তেও জুয়াখেলার অনিশ্চয়তা ও অদৃষ্টবাদিত্ব আরোপ করিয়াছে।"[১৭] *পুতুলনাচের ইতিকথা* উপন্যাসে নিয়তিবাদের কথা উঠে এসেছে। বিধাতার ইচ্ছার খেলায় মানুষ হয়েছে উপাদান। পাশ্চাত্য নিয়তি তাড়িত জীবনের আভাস এ উপন্যাসে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে।

পদ্মানদীর মাঝি (১৯৩৬) উপন্যাসটি- *পুতুলনাচের ইতিকথা* (১৯৩৬) উপন্যাসের সমসাময়িক সময়ে রচিত সর্বাধিক জনপ্রিয় উপন্যাস। *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখক সত্ত্বার পরিচিতির স্মারক বলাই সমুচিত। এর জনপ্রিয়তার ছায়াতলে আশ্রয় মিলেছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যসকল রচনার জনপ্রিয়তা। *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসটি বেশ কয়েকটি ভাষায় অনূদিত হয় এবং চলচ্চিত্র রূপেও চিত্রায়িত হয়েছে। বিষয়বস্তুর বিবর্তনের এই উপন্যাসটিতে স্থান পেয়েছে অশিক্ষিত, সীমাহীন অভাব-দারিদ্র্যক্লিষ্ট ধীবরদের জীবনকথা। জেলে জীবনের সত্য গল্পই যেন 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাস।

পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসের নায়ক কুবের। এই উপন্যাসে কুবের চরিত্রটি জেলে সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। জেলেজীবন না পাওয়ার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। জীবন এখানে প্রতিমুহূর্তে সংকটময়। জীবন ও জীবিকার সকল প্রয়োজনই যেন খণ্ডাংশ রূপে ভাগ্যে জোটে জেলে সম্প্রদায়ের। খাবার থেকে শুরু করে জীবনের সকল চাহিদাতেই যুক্ত আছে 'না' শব্দটি। রাতদিন নদীর সাথে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকে ধীবর জনগোষ্ঠী। কুবের ও গণেশের নিজের নৌকা নাই। ধনঞ্জয়ের নৌকায় মাছ ধরে। নৌকার মালিক বিধায় ধনঞ্জয় কম পরিশ্রম করেও মাছের সমান অংশ পায়। কুবের ও গণেশের অনুপস্থিতিতে বেশি টাকায় মাছ বিক্রি করে। কুবের ধনঞ্জয়ের সকল চালাকি অনুধাবন করলেও প্রতিবাদের সাহস পায় না। এভাবেই কুবেরের মতো সকল জেলে ক্রমাগত শোষণের শিকার হয়। জেলে সমাজে হাতে গোনা দুই-একজন একটু অবস্থাসম্পন্ন- নৌকা ও জালের মালিক। তারাই শোষক। জোঁকের মতো নিরুপায় জেলেদের রক্ত চুষে খায়। রাত-দিন পরিশ্রম করেও কুবেরের ঘরে ছাউনি জোটে না, জোটে না ভালো খাবার, সন্তানের দুধ ও চিকিৎসার খরচ। এমন দরিদ্রাবস্থায় শীতলবাবুর মতো উস্কানিদাতার উস্কানিতে ক্ষুধার্ত কুবেরের সৎ থাকা কঠিন হয়। অবশেষে নগদ অর্থের নেশায় চুরি করে মাছ বিক্রি করে শীতলবাবুর কাছে। শীতলবাবুও কুবেরকে ঠকায়। নগদ অর্থ না দিয়ে মাছ নিয়ে চলে যায়। চুরি করা মাছ হওয়ায় কুবের প্রতিবাদ করতে পারে না।

অভাব দারিদ্র্যের মাঝেও কুবের প্রেমিক পুরুষ। স্ত্রী মালা তার তিন সন্তানের জননী। চলৎশক্তিহীন পঙ্গু মালাকে নিয়ে কুবেরের সামাজিক জীবন। চঞ্চলা শ্যালিকা কপিলার দুরন্তপনা কুবেরের প্রেমিক সত্তাকে চঞ্চল করে তোলে। নদীর ঘাটে একাকী কপিলাকে কাছে টানে কুবের। অস্থির মনে কুবের কপিলার শ্বশুরবাড়ি আকুরটাকুর গ্রামে হাজির হয়। কপিলাকে দেখার প্রবল বাসনায় সন্তানসন্ততিসহ দোলের দিনে চরডাঙ্গা গ্রামে উপস্থিত হয়। কপিলাকে ভালোবাসার স্পষ্ট বহিঃপ্রকাশে কুবেরের উক্তি -"তোর লাইগা দিবারাত্র পরানডা পোড়ায় কপিলা।"[১৮] রাসুর চক্রান্তে চুরির অপরাধে পুলিশ কুবেরকে ধরতে আসলে সে কপিলাকে সাথি করে হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। পেছনে ফেলে যায় চিরচেনা গ্রাম, পঙ্গু স্ত্রী মালা ও তার সন্তান সন্ততি।

কপিলা প্রাণবন্ত এমনই এক নারী যে বোনের স্বামীর প্রতি অনুরক্ত। কপিলা অবচেতন মনে কুবেরকে প্রতিনিয়ত জীবনসঙ্গী হিসেবে কামনা করে। "কপিলার আদিম ও সংস্কৃত মনোবৃত্তির মধ্যে ছলনাময়ী নারী প্রকৃতির সনাতন রহস্য বাসা বাঁধিয়াছে।"[১৯] তার অবচেতন মনের প্রবল চাওয়ায় সৃষ্ট মানসিক অস্থিরতায় লোকলাজে ভীত কপিলা। কুবেরকে সে ধরা দিয়েও দেয় না। কথায় কথায় চতুরতার আশ্রয় নিয়েছে। অবচেতন মনে লালন করা বাসনা প্রকট হয়ে ওঠে কুবেরের ময়নাদ্বীপে চিরতরে চলে যাওয়ার মুহূর্তে। কাতর কণ্ঠে আবেদন করে বসে "আমারে নিবা মাঝি লগে ?"[২০] চরম মুহূর্তে কপিলা তার সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হয়ে উঠে।

পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে জেলে জীবনের দুঃখ দুর্দশার কথা। প্রতিনিয়ত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার মাধ্যমে প্রাণ রক্ষা করে পদ্মা নদীর মাঝিরা। সেই বাস্তবতাবোধের আলোকে গড়ে উঠেছে উপন্যাসের প্লট। উপন্যাসটিতে দারিদ্র্যক্লিষ্ট লিবিডোতাড়িত নির্মম জীবনের চলমান কাহিনি ফুটে উঠেছে। "উনিশ শতকীয় বাস্তববাদী আন্দোলনের চেতনা বিশ শতকে ফ্রয়েডীয় বিশ্লেষণ ধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে নতুন মাত্রা অর্জন করে। মানিক ছিলেন তারই বলিষ্ঠ ধারক। শুধু তাই না, রুশ বিপ্লবের অনুপ্রেরণায় এই ধারাটিই রূপান্তরিত হয় সমাজ বাস্তববাদী চেতনায়। ফলে উনিশ শতকীয় বাস্তববাদ বিশ শতকের সমাজ রূপান্তরমূলক চেতনা সহযোগী হয়ে পড়ে মূলে স্থূল পৃথক এবং তা উত্তীর্ণ হয় সম্পূর্ণ নতুন এক বস্তুবাদী বোধের রাজ্যে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাস্তববাদী চেতনা গঠনে বিশ শতকীয় এই মনোবাস্তবতা সমাজ বাস্তবতার যুগপৎ ভূমিকা সক্রিয়।"[২১] 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে রাসু, পীতম মাঝি, শীতল আমিনুদ্দিন এবং হোসেন মিয়া। রাসু চরিত্রটি স্বার্থপর ও লিবিডোতাড়িত। কন্যা তুল্য কুবেরের মেয়ে গোপিকে বিয়ে করতে চায়। কুবের বয়স্ক রাসুর সঙ্গে গোপির বিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানালে রাসু চরিত্রের কূটকৌশল ও স্বার্থপরতা প্রকাশ্যে আসে। রাসু কুবেরকে মিথ্যা টাকা চুরির অপরাধে ফাঁসিয়ে দেয়। আশ্বিনের ঝড়ে স্ত্রী সন্তান হারিয়ে একা আমিনুদ্দি পাড়ি জমায় হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপে। সেখানে বিয়ে করে নতুন সংসার রচনা করে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে আমিনুদ্দির নিঃসঙ্গ হওয়া প্রতীক মাত্র। প্রকৃতপক্ষে এমন ঘটনা জেলেপাড়ায় ঘটে যাওয়া নিত্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঝড়, জ্বলোচ্ছ্বাস এবং প্রকৃতির উন্মত্ততায় জেলে পাড়ার মানুষ প্রতিনিয়ত এভাবেই আত্মীয় স্বজন হারায়। জন্মের উৎসব এখানে আনন্দের নয়। শত দারিদ্র্যে বিবর্ণ হয়েছে জন্মোৎসব। ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, রোগ-শোক, মহামারি, অভাব ও দুর্যোগের সাথে চলে জেলে জীবনের নিত্য সংগ্রাম।

পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসের বিতর্কিত চরিত্র হোসেন মিয়া। লেখক নিজেই চরিত্রটিকে উপস্থাপন করেছেন রহস্যময় লোক হিসেবে। হোসেন মিয়া যৌবনে ভাগ্যান্বেষণে পদ্মার তীরবর্তী এই গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিল। সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন হোসেন মিয়া জীবিকার প্রয়োজনে বৈধ এবং অবৈধ উভয় পথ অবলম্বন করেছে। নিজের ভাগ্যোন্নয়ন করেছে। ছেঁড়া লুঙ্গির পরিবর্তে বর্তমানে হোসেন মিয়ার পরনে থাকে নতুন পাঞ্জাবি ও নতুন লুঙ্গি। সমালোচকের মতে "পুঁজিবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্নে বুর্জোয়া শ্রেণির মধ্যে যেরূপ স্বপ্ন, নিরলস উদ্যোম, অধ্যবসায়, সাহস ও পুঁজিগঠনে নীতিহীন প্রয়াস আমরা লক্ষ্য করি, হোসেন মিয়া চরিত্র তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।"[২২] হোসেন মিয়া চরিত্রটি চতুর। বৈধ-অবৈধ পথে উপার্জনের মাধ্যমে বিত্তশালী হলেও টাকাওয়ালাদের সাথে হোসেন মিয়া আন্তরিক ভাবে মিশেন না। দরিদ্র জেলেদের সঙ্গে হোসেন মিয়ার আত্মার সম্পর্ক। জেলেদেরকে তিনি বন্ধু বলে পরিচয় দেন। বিশ্লেষকের মতে- "মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এমন ইঙ্গিত দেননি যে, সামন্ত প্রভেদের পাশে বুর্জোয়ার এই নিচে নেমে আসাটা একটি কৌশলমাত্র।"[২৩] হোসেন মিয়া সমুদ্রের মাঝে ময়নাদ্বীপের মালিক। ময়নাদ্বীপের মালিকানা অধিকার করা হোসেন মিয়ার স্বপ্নের ভূমিতে স্বপ্নবীজ বপন করার তুল্য। হোসেন মিয়ার স্বপ্ন ময়নাদ্বীপ হবে সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে। এ দ্বীপের মানুষের একটি ধর্ম থাকবে তা হচ্ছে মানবধর্ম। হোসেন মিয়া ময়নাদ্বীপে মসজিদ মন্দির তৈরি করে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করার বিপক্ষে। এ দ্বীপে ধনী-গরীব বৈষম্য থাকবে না। আপাতদৃষ্টিতে হোসেন মিয়ার এরূপ স্বপ্ন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কমিউনিজম বা সমাজতান্ত্রিক ঐক্যের সুপ্ত বাসনা বলেই মনে হয়। অন্যদিকে সমালোচকদের মতে,-"ময়নাদ্বীপকে জনবসতিতে পূর্ণ করার বাসনা কোনো মানবসেবায় উৎসর্গীকৃত প্রাণের স্বপ্ন নয়। এটি একটি মাদক চোরাচালানির সাম্রাজ্য বা উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা মাত্র।"[২৪] সমাজের নিয়ত পরিবর্তনশীল রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে হোসেন মিয়ার রহস্যময় রূপটি ফুটে উঠে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দিকে ধাবিত হওয়ার পরোক্ষ প্রমাণ যেন হোসেন মিয়া চরিত্রটি।

হোসেন মিয়ার স্বীকারোক্তি সে জেলেদের জান দিয়ে দরদ করে। তাদের দুঃখ কষ্টগুলো নিজের বলে অনুভব করে। এই কষ্টবোধ থেকেই হোসেন মিয়ার টাকায় আশ্বিনের ঝড়ে লণ্ডভণ্ড জেলেপাড়ার প্রতিটা ঘরে নতুন ছাউনি উঠে। নতুন বাঁশের খুঁটি লাগানো হয়। শর্ত থাকে যে সকল জেলেকে একটা কাগজে টিপসই দিতে হবে। সম্ভবত এভাবেই কৌশলে অসহায়, অশিক্ষিত জেলেদের বর্তমান ভিটেমাটি নিজের নামে করে নিচ্ছে হোসেন মিয়া। অশিক্ষিত নিরূপায় জেলেরা বিষয়টি অনুধাবন করতে পারে না অথবা অনুধাবন করলেও অপূর্ণ জীবন ও অসহায়ত্বের তীব্রতায় তাদের কিছুই করার থাকে না। সীমাহীন দারিদ্র ক্লিষ্ট জীবনে তাদের প্রতিবাদ প্রকাশের ভাষা হারিয়ে গেছে। কেননা একমাত্র হোসেন মিয়ার কাছেই তারা তাদের প্রয়োজনের কথা বলতে পারে । বিপদে-আপদে হোসেন মিয়ার দ্বারস্থ হতে হয়। হোসেন মিয়ার চালাকি বুঝলেও সবাইকে নিরুপায় হয়েই চুপ থাকতে হয়। হোসেন মিয়া সম্পর্কে উপন্যাসের শেষাংশে কুবেরের উক্তি হোসেন মিয়ার স্বার্থপরতার প্রমাণ দেয়। "হোসেন মিয়া দ্বীপি আমারে নিবই কপিলা। একবার জেল খাইটা পার পামু না। ফিরা আবার জেল খাটাইব।"[২৫] হোসেন মিয়া প্রকৃতপক্ষে স্বার্থপর। ময়নাদ্বীপে প্রাণ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন পূরণে সে জেলেদের তার আপন করে নিয়েছে। ময়নাদ্বীপে জনবসতি গড়ে তোলার মানসে হোসেন মিয়া নারী-পুরুষের অনৈতিক সম্পর্ককেও মেনে নিয়েছে। "পদ্মার স্রোতরাশি যেমন সমুদ্রে মিশিয়াছে সেইরূপ গ্রামের প্রায়

প্রত্যেকটি লোকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবন প্রবাহ, তাহাদের স্বতন্ত্র কর্মপ্রচেষ্টা ও আশা-কল্পনা শেষ পর্যন্ত হোসেন মিয়ার মনোগহনের অতল গভীরতায় আশ্রয় ও সমাপ্তি লাভ করিয়াছে।"[২৬] এ উপন্যাসে হোসেন মিয়া চরিত্রটি পাঠক মনে এক রহস্যের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেছে।

ময়নাদ্বীপের স্বপ্ন পূরণে মরিয়া হোসেন মিয়া মাথায় টুপি পরেও অধর্ম তথা অবৈধ সম্পর্ককে মেনে নিয়েছে। কুবেরও বুঝেছিল কপিলাকে সাথে নিয়ে ময়নাদ্বীপে যাওয়াতে হোসেন মিয়ার কোন আপত্তি থাকবে না। কুবেরের অবচেতন মনের গভীর চাওয়া কপিলার মতো প্রাণচঞ্চল জীবনসঙ্গী। চাওয়াটিকে পরিপূর্ণ করতে কুবের দ্বিতীয়বার মালার কথা ভাবে না। কপিলাকে সাথে নিয়ে পাড়ি জমায় ময়নাদ্বীপের উদ্দেশ্যে। কপিলা পরিণত বুদ্ধিসম্পন্না নারী চরিত্র। কপিলা মাত্র ইন্দ্রিয় লালসা চরিতার্থ করার জন্য কুবেরকে ভালোবাসে এমনটিও নয়। কপিলা চরিত্রে সংযমী মনোভাবও পরিলক্ষিত হয়। সর্বোপরি বোনের সংসারের প্রতি তাঁর প্রচণ্ড মায়া। প্রেম ও কামে বিভোর কুবেরকে সে উপস্থিত বুদ্ধির সাহায্যে পরাস্ত করে তার বিচারবোধের প্রমাণও দিয়েছে। কপিলা সমাজ-সংসার ধর্মীয়রীতি সংস্কারকে অস্বীকার করতে পারে না। সঙ্গত কারণেই কুবের কপিলার আকর্ষণে আকুরটাকুর গ্রামে গেলেও কপিলা তাকে সঙ্গ দিতে পারে না। কপিলা সামাজিক সংস্কার বশত সংসারকেই আকড়ে ধরতে চায়। আবেগে অভিমানে তাকে ভুলে যাওয়ার কথাই বলে। স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে এবং পরবর্তীকালে কপিলার বোনের বাড়িতে অবস্থানরত অবস্থায় কুবেরের প্রতি অধিক প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়ে। তবে কপিলার প্রণয়ের সূচনা এখান থেকেই নয়, শ্যালিকা-দুলাভাইয়ের ছোট ছোট আবেগের মাঝে বহুপূর্বেই প্রণয়াবেগ উভয়ের মনে একটু একটু করে শিকড় গেড়েছে। সময়ের বিবর্তনে অব্যক্ত প্রণয় মহীরুহে পরিণত হয়েছে।

জীবনের জটিলতা উপন্যাসটি *পদ্মানদীর মাঝি* ও *পুতুলনাচের ইতিকথা*- উপন্যাসের সমসাময়িককালে প্রকাশিত। *জীবনের জটিলতা* সম্পূর্ণরূপে একটি মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। এই উপন্যাসে লিবিডোতাড়িত মানুষের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব এবং করুণ পরিণতি চিত্রাঙ্কিত হয়েছে। শান্তা মামার সংসারে নিয়ত টানাপোড়েন আর বঞ্চনার মাঝে বড় হয়েছে। বিয়ের পরে স্বামীর অস্বাভাবিক অধিকার প্রয়োগের যন্ত্রণায় বিষিয়ে ওঠে শান্তার মন। স্বামীর এহেন অত্যাচার থেকে অব্যাহতি পেতে আকৃষ্ট হয় বিমলের প্রতি। প্রেমিক বিমল লেখক হলেও লিবিডোর আকর্ষণকে উপেক্ষা করতে পারে না। অন্যদিকে শান্তার মনও বিনয়ের সান্নিধ্য কামনায় আকর্ষণ অনুভব করে। শান্তা স্বামীর স্বভাবকে মেনে না নিয়ে বিদ্রোহের প্রয়োজনে স্বামীকে ত্যাগ করতেও পারত কিন্তু সে পথ শান্তা অবলম্বন করে না। "বিদ্রোহ করে জীবনকে একটি সরলরেখায় দাঁড় করাতে তার কোনো আগ্রহ নেই; বিমলও জানে শান্তাকে কিছুক্ষণ বুকের মধ্যে ধরে রাখলেও সারাজীবনের মতো এই ঘটনাকে চিরস্থায়ী করতে গেলে সেটা নিছক নাটুকেপনা হবে।"[২৭] বিনয় এবং শান্তার বন্ধুত্ব ক্রমান্বয়ে প্রণয়ে রূপ নিয়েছে। স্বামীর বঞ্চনা এবং বিমলের বন্ধুত্বের নির্ভরশীলতা শান্তাকে বিমলের প্রতি প্রণয়াসক্ত করে। লেখক এ উপন্যাসের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন-"মানুষের স্বাধীন প্রণয়বৃত্তি সামাজিক, সাংসারিক ও ধর্মীয় সংস্কারকে মান্য করে না। আবার এও দেখিয়েছেন, মানুষের মধ্যেই যেমন এরূপ স্বাধীন প্রণয়াকাঙ্ক্ষা আছে, তেমনই ওইসব সংস্কার থেকেও সে মুক্ত নয় সম্পূর্ণভাবে। এবং এর টানাপোড়েনে কখনো কখনো আমাদের অন্তর্গত সত্তায় আর কি টাইপ হয়ে- থাকা ওইসব সংস্কারের জয়ী হওয়াও অস্বাভাবিক

নয়।"[২৮] অধর ও বিমল দুজনেই শান্তাকে মুক্তি দিয়েছিল। অধর মামার সংসারের নিত্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তির দূত হিসেবে শান্তার জীবনে এসেছিল। অধরের মাত্রাতিরিক্ত কর্তৃত্বপরায়ণ স্বামিত্বের পেষণে বিপর্যস্ত বিমর্ষ শান্তার মনকে শান্ত করেছিল বিমল। দুদিকের টানাপোড়েন শান্তাকে করেছিল মানসিক বিকারগ্রস্ত। পরিণতিতে শান্তা আত্মহননের পথ অনুসরণ করে। ফ্রয়েডীয় মনোচেতনার আঙ্গিকে জীবনের জটিলতা উপন্যাসের কাহিনি বিন্যাস ও চরিত্র নির্মাণ করেছেন লেখক।

অমৃতস্য পুত্রঃ (১৯৩৮) উপন্যাসের মূলবিষয় চরিত্রের মনোবিশ্লেষণ। এই উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রের স্নেহ-প্রেম, পাওয়া-না পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, সামাজিকতা, আত্মকেন্দ্রিকতা এবং স্বার্থপরতার চিত্র ফুটে উঠেছে। সামাজিক ও পারিবারিক শ্রেণির উপন্যাস হিসেবে এই উপন্যাসের চরিত্রগুলোতে সংযুক্ত হয়েছে গভীর মনোবিশ্লেষণ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সংকটের চিত্র। *শহরতলী* উপন্যাসটি দুটি খণ্ডে যথাক্রমে ১৯৪০ ও ১৯৪১ সালে প্রকাশিত হয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেতনার মূলসুরের বাঁকপরিবর্তন সূচিত হয়েছে *শহরতলী* উপন্যাসের মাধ্যমে। উপন্যাসে এই লেখকের মধ্যে অনেকটা রাজনীতি সচেতনতা লক্ষ করা যায়। "লিবিডো তাড়নাই মানুষের জীবনের একমাত্র নিয়তি নয়, মানবজীবনে অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ আরো শক্তিশালী কিংবা প্রজননের চেয়ে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ-এ উপলব্ধিই সাহিত্যরূপ লাভ করেছে শহরতলীতে।"[২৯] *শহরতলী* উপন্যাসের সত্যপ্রিয় শোষক চরিত্র। সত্যপ্রিয় বিশিষ্ট শিল্পপতি এবং বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার ধারক। যশোদা চরিত্রটি মানবিকতাবোধে পুষ্ট। শ্রমিকদের প্রতি আন্তরিকতা ও ভালোবাসায় সহমর্মী যশোদা। শ্রমিকদের সুখ দুঃখের চিরসাথী হিসেবে তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে। সত্যপ্রিয়র কুচক্রীতায় যশোদা শ্রমিকদের বিশ্বাস হারিয়ে অপমানিত ও চরম ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সে প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে ওঠে না। বাংলা সাহিত্যে মানবিকতার এক অনন্য ধারক যশোদা চরিত্রটি। *শহরতলী* উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সুশৃংখলভাবে নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের জীবনচিত্রকে পাশাপাশি উপস্থাপন করেছেন। লেখক মধ্যবিত্ত স্তরের মানুষের সম্মান রক্ষার চেষ্টা ও মানসিক অস্থিরতার তীব্র সমালোচনা করেছেন। "এই মধ্যবিত্ত স্তর সম্পর্কে মানিকের মতোই যশোদার ছিল প্রবল বিরূপতা। পরিবর্তে সকল সহানুভূতি আর বাঁধভাঙা মমতা ব্যক্ত হয়েছে শ্রমজীবী মানুষের প্রতি।"[৩০] *অহিংসা* (১৯৪১), *ধরাবাঁধা জীবন* (১৯৪১), *প্রতিবিম্ব* (১৯৪৩) উপন্যাসে মানিক এক স্বতন্ত্র শিল্পী।

উপন্যাসের বিষয়বস্তুর বিবর্তনে লক্ষ করা যায়-এ পর্বেই মানিকের কমিউনিজম বা মার্কসবাদী দর্শনে একাত্ম হওয়ার উদ্দেশ্যে শুভ যাত্রার সূচনা হয়েছে। এ পর্যায়ে লেখকের ফ্রয়েডীয় মনোচেতনার সমাপ্তি ও মার্কসীয় দর্শনের প্রবেশ নব বিষয়বস্তুর সমাবেশে এই উপন্যাসগুলো কাঠামোবদ্ধ রূপ লাভ করেছে। সন্ধিক্ষণের সৃষ্টি এ উপন্যাসগুলোতে চরিত্র বিশ্লেষণের পাশাপাশি বুর্জোয়া শ্রেণিচেতনা ও সামাজিক বৈষম্য লক্ষণীয়। শোষক চরিত্রগুলো এ পর্যায়ের উপন্যাসে বাস্তবসম্মতভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। বিষয়বস্তুর বিবর্তনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরবর্তীকালের উপন্যাসে রাজনৈতিক চেতনা প্রধান্য লাভ করেছে। পূর্বের উপন্যাসের মুখ্য বিষয় ছিল ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণ। ১৯৪৪ পরবর্তীসময়ের উপন্যাসে মার্কসবাদী জীবনসমীক্ষা তথা বুর্জোয়া সমাজের মুখোশ উন্মোচনই হল মুখ্য বিষয়।

মানিকের দ্বিতীয় ভাগের উপন্যাস অর্থাৎ মার্কসবাদী চেতনাধর্মী উপন্যাসের মধ্যে *চিহ্ন*, *জীয়ন্ত*, *সার্বজনীন*, *সোনার চেয়ে দামি*সহ বেশ কিছু উপন্যাস উল্লেখযোগ্য। প্রথম পর্যায়ের উপন্যাস *পদ্মানদীর মাঝি* ও *পুতুলনাচের ইতিকথা* উপন্যাসের মতো জনপ্রিয় না হলেও এ উপন্যাসগুলো রাজনৈতিক চেতনায় সমৃদ্ধ- নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উপস্থাপিত। "মার্কসবাদ তাকে জীবন সম্পর্কে একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছিল যা তাঁর পূর্ববর্তী সাহিত্যে অনুপস্থিত ছিল।"[৩১] *চিহ্ন* (১৯৪৭) উপন্যাসটির কাহিনির মূলে গ্রথিত হয়েছে ভারতীয় মুক্তিসংগ্রামের ঐতিহাসিকতা। ১৯৪৫ সালের পরে অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ভারতীয় জনগোষ্ঠী স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধির পিপাসায় পিপাসার্ত হয়। স্থানীয় জনগণ তথা ছাত্রসমাজ, যুবসমাজ সর্বোপরি শ্রমিকরাও আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। ভারতের স্বাধীনতা কামনায় আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে রামেশ্বর নামে একজন ছাত্র মারা যায়। বিক্ষোভ-মিছিল-অবরোধে বিষয়টি বিকট আকার ধারণ করলে পুলিশ প্রশাসন অবরোধ তুলে নেয়। এতে বিক্ষোভকারীদের দলে মিশে যায় লক্ষ লক্ষ মানুষ। তারা রাস্তায় নেমে মিছিল করে। *চিহ্ন* উপন্যাসের বিষয়ভাবনায় মূলত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটটি দৃশ্যমান হয়। 'গণ-সংগ্রামের জোয়ারকে কেন্দ্র করে এই বইটি রচনা করতে গিয়ে লেখক বহু চরিত্রের উপস্থাপনা করেছেন এবং তারা এক-একটি স্কেচের মতো হলেও সামগ্রিকভাবে একটি যুগ ও যুগের যন্ত্রণাকে প্রকাশ করতে পেরেছেন।"[৩২] *চিহ্ন* উপন্যাসের প্রত্যেকটি চরিত্রই আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। প্রায় সকল চরিত্র পুলিশের লাঠিচার্জ ও এলোপাতাড়ি গুলিতে আহত ও গুলিবিদ্ধ হয়েছে। স্বাধীনতাকামী মুক্তিপিপাসু জনগণ শতবিরোধে ক্ষতবিক্ষত হয়েও বিদ্রোহের রাস্তা ছেড়ে ঘরে ফিরে আসে নি। উপন্যাসের শুরুতেই গুলিবিদ্ধ গণেশের আক্ষেপ-"এরা বসে দাঁড়িয়ে থাকবে বাবু? এগোবে না?"[৩৩] গণমানুষের আন্দোলনে গণমানুষের অংশগ্রহণ ছিল সফলতার শীর্ষে। বিদ্রোহী জনগণের অংশগ্রহণের জোয়ারে গণেশের শেষ মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছিল। সাধারণের স্বাধিকার চেতনার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ গণেশ দেখতে পেল না; দেখতে পেল তার বাবা-মা ও ভাই-বোন। প্রকৃতপক্ষে অগ্রদূতের রক্তের বিনিময়ে পরিষ্কার হয় পথের জঞ্জাল। জঞ্জালমুক্ত সেই পথ ধরেই পরবর্তী প্রজন্ম নির্দ্বিধায় সামনে অগ্রসর হয়। একুশ-বাইশ বছরের গণেশ কলকাতায়-'বিদ্যুৎ লিমিটেড' এ চাকরিরত ছিল। প্রতিষ্ঠানের মালিক দাশগুপ্তের বিদেশি মদ চোরাকারবারের কাজে পথে বের হয়ে পুলিশের গুলিতে গুলিবিদ্ধ হয় গণেশ। ওসমান গণেশকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। বিদ্রোহী ওসমানের ছেলে হাবিব পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। নিরুদ্দেশ গণেশকে খুঁজতে তার মা ও বাবাসহ আত্মীয়-পরিজনরা কলকাতায় এসে দেখে দাঙ্গা থেমে গেছে। অন্যদিকে হাসপাতালের মর্গে অবহেলায় পড়ে থাকা গণেশের লাশে পচন ধরেছে।

বিধবা অনুরুপা দুই পুত্র হেমন্ত ও জয়ন্ত এবং কন্যা রমাকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে আছে। বিধবার যক্ষেরধন হেমন্ত ও বালক জয়ন্তকে মা অনুরুপা কিছুতেই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করতে দিতে চায় না। হেমন্ত বন্ধুদের কাছে উপহাসের পাত্র হাওয়ায় সেও একসময় জনসভা ও শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। হেমন্ত গুলিবিদ্ধ হলে আহত অবস্থায় পরদিন আবারও মিছিলে অংশগ্রহণ করে। জয়ন্ত গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। কিশোর রজত প্রাণের আবেগকে দমন করতে না পেরে অবস্থান ধর্মঘটকারীদের দলে মিশে যায়। সঙ্গত কারণেই অপরিণত বয়সেও সে মানুষের সংগ্রামে একাত্ম হয়ে যায়। কলেজছাত্র রসুল অবস্থান ধর্মঘটকারীদের একজন। রসুলের ডানহাতে গুলি লাগলেও সে ব্যথায় কাতর হয়ে পড়ে না। রসুলের প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। ঘটনাচক্রে গ্রেপ্তার হওয়ার পরেও

অসার শরীরে শুধু মনের জোরে পুলিশের চোখ এড়িয়ে বেরিয়ে আসে। এছাড়াও অজয়, অক্ষয় ও অমৃত মজুমদারসহ উপন্যাসের সকল চরিত্র অবস্থান ধর্মঘটকারীদের দলে মিশে যায়। সর্বভারতীয় জনগণের প্রাণের চাওয়া পূরণে এভাবেই উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র ক্ষোভে ফেটে পড়ে। একাত্ম হয়ে অবস্থান ধর্মঘটসহ মিছিলে অংশগ্রহণ করে। "একটি রাজনৈতিক ঘটনার প্রভাব যে কত সুদূরপ্রসারী, কত বিচিত্র, বিস্তৃত ও ব্যাপক হতে পারে তারই অনুপুঙ্খ বিবরণে *চিহ্ন* উপন্যাস সমগ্রতা লাভ করেছে।"[৩৪] *চিহ্ন* উপন্যাসটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্য সকল উপন্যাস থেকে স্বতন্ত্র। "রশিদ আলী দিবসের ছাত্র আন্দোলনের উপর রচিত 'চিহ্ন' অনন্য মার্কসবাদী উপন্যাস-একটি খাঁটি রাজনৈতিক উপন্যাস।"[৩৫] একাধারে রাজনৈতিক আবহের পাশাপাশি পুঁজিবাদী সমাজের চিত্রটি 'চিহ্ন' উপন্যাসে অতি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। পুঁজিবাদী সমাজে পুঁজিপতির অমানবিক নিষ্ঠুর কার্যকলাপ উপন্যাসের কাহিনি পরিক্রমায় স্তরে স্তরে সুনিপুণভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সার্বজনীন (১৯৫২) উপন্যাসের প্রেক্ষাপট ১৯৪৬-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও ১৯৪৭-এর দেশভাগ পরবর্তী ভারতীয় উপমহাদেশ। এ দেশের শাসন থেকে হাত গুটিয়ে নেওয়ার বিষয়ে ব্রিটিশ শাসকরা নিশ্চিত হয়ে পড়েছিল। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার লক্ষ্যে তারা সর্বশেষ কূটকৌশল অবলম্বন করে। তাদের উস্কানিতে ভারতবর্ষে শুরু হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ফলে ভারতবর্ষের প্রধান দুটি ধর্মের হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় পরস্পর বিভক্ত হয়ে দুটি আলাদা অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে যায়। *সার্বজনীন* উপন্যাসের মহেশ্বরের পরিবার বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমায়। বাংলাদেশের সমুদয় সম্পত্তি পানির দামে অর্থাৎ নামমাত্র দামে বিক্রি করে মহেশ্বর সপরিবার কলকাতাগামী ট্রেনে চেপে বসে। ট্রেনের মধ্যে মহেশ্বরের মত অগণিত উদ্বাস্তুদের দুর্ভোগের চিত্র তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। একটু আশ্রয় আর খাবারের জন্য মানুষের সংগ্রামের সত্যচিত্রই যেন তিনি প্রকাশ করেছেন *সার্বজনীন* উপন্যাসে। দেশভাগের পরে বাংলাদেশ থেকে ভারতে যাওয়া হিন্দু সম্প্রদায়ের ছিন্ন জীবনের প্রতীক হিসেবে উপন্যাসে স্থান পেয়েছে মহেশ্বর ও তার পরিবার। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এ উপন্যাসের বিষয়বস্তুতে একক ব্যক্তির সার্বজনীনতা প্রাপ্ত হওয়ার প্রক্রিয়াটি দেখিয়েছেন। আত্মকেন্দ্রিক জীবন ভাবনার সংকীর্ণ সীমার মধ্যে যে কষ্ট, যে হতাশা ও যন্ত্রণা অসহনীয় হয়ে ওঠে তা জীবন বাস্তবতার সত্য সন্ধানে ঐক্যবদ্ধ রূপকল্পনায় সার্বজনীন ব্যাপকতার মধ্যেই স্বস্তি লাভ করে।

মহেশ্বর দেশত্যাগ করার পূর্বে পানির দরে সকল সম্পদ বিক্রি করে কলকাতায় ছোট একটি বাড়ি কিনে অন্তত বসবাসের স্থানটি নির্দিষ্ট করে। জমানো টাকায় পুজোর উৎসব পালনসহ সচ্ছলভাবে দিনাতিপাত হচ্ছিল। কাহিনি পরিক্রমায় জামাই ও পুত্রের ব্যবসার নেশা তাকে সর্বস্বান্ত করে। ব্যবসার নামে টাকা নিয়ে তারা মহেশ্বরের জমানো টাকার একটা বড় অংশের অপচয় করে। মহেশ্বর বাড়িতে দুইবার দুর্গাপূজা উদযাপন করে ধর্মোৎসব পালন করতে সক্ষম হয়। ব্যবসায় লোকসান হওয়াতে আর্থিক সংকটের সীমাহীন পর্যায়ে পরবর্তীবছরে দুর্গাপূজা কার্যকর করার মতো সমুদয় অর্থের জোগান সম্ভব হয়ে উঠে না। শুরু হয় এ চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন। দুর্গাপূজা উদযাপন মহেশ্বরের সাত পুরুষের প্রথা। পিতাকে দেওয়া কথা রক্ষা করতে না পারার যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হয় মহেশ্বরের মন। বহুমুখী সংকট থেকে উত্তীর্ণ হয়ে

মনকে জাগ্রত করে মহেশ্বর এবং পাড়ার দুর্গাপূজার প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করে। যথাযথভাবে পাড়ার পূজা পরিচালনা করতে গিয়েই মহেশ্বরের ব্যক্তি চিন্তার সংকীর্ণতা দূর হয়। সার্বজনীন চিন্তায় আত্মোন্নয়নের পথে সে প্রশান্তির সন্ধান পায়। "আত্মকেন্দ্রিক সুখ সন্ধানের মধ্যে যে আনন্দ লাভ, তা সাময়িক ও ভঙ্গুর; বিশেষত আত্মকৃত পাপযন্ত্রণা কিংবা বাহ্যিক ঘটনার আলোড়ন সেই সুখস্পৃহার মূলে যখন ব্যাঘাত সৃষ্টি করে, মানুষের জীবনে তখন নিরানন্দ হয়ে ওঠে সর্বগ্রাসী। সার্বজনীন মানবকল্যাণে আত্মনিবেদনের মধ্যদিয়েই মানুষ এই নিরানন্দের সর্বাত্মক হতাশা থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়।"[৩৬] শ্রমজীবী জীবনের প্রতীক হয়েছে পদ্মা ও সাধন চরিত্র। উচ্চবিত্তের সন্তান হয়েও পদ্মা গাড়ির ড্রাইভার কান্তিলালকে বিয়ে করে মধ্যবিত্তের সংসারে প্রচণ্ড টানাপোড়েনে বেছে নিয়েছে সেলাইয়ের কাজ। সাধন ব্যবসায় ব্যর্থ হয়ে বসে থাকে নি। সে কর্মমুখী হয়ে উঠেছে। জুতার সোল বিক্রির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করেছে। পরিশ্রমের মাধ্যমে জীবিকা অর্জনে সফল হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের পরে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকাশিত সকল উপন্যাসে রাজনৈতিক আবহ পরিলক্ষিত হয়। "মানিকের রাজনৈতিক সক্রিয়তার কালসীমা যত বর্ধিত হয়েছে, মানিকের দৃষ্টি রাজনীতির বহির্বাস্তবতা থেকে সরে গিয়ে অন্তর্বাস্তবতায় ততবেশি স্থির হয়েছে।"[৩৭] মানুষের অন্তঃগভীরের আর্তনাদকে নিবিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিতে যেন উপলব্ধি করতে এবং তা অকপটে প্রকাশ করতেও সক্ষম হয়েছিলেন তিনি।

সার্বজনীন উপন্যাসের মতো একই সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সমস্যার প্রেক্ষাপটে *সোনার চেয়ে দামি* উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। *সোনার চেয়ে দামি* উপন্যাসটি দুইখণ্ডে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসে ১৯৪৭ এ দেশভাগের ফলে বিদ্যমান উদ্বাস্তু সমস্যার চিত্রসহ লেখক নানা সামাজিক ও অর্থনৈতিক পীড়নে পর্যুদস্ত মানুষের সংকটময় জীবনকে ব্যাখ্যা করেছেন। *সোনার চেয়ে দামি* উপন্যাসে নারীর সোনার গহনার প্রতি মোহ এবং জীবিকার প্রয়োজনে স্বেচ্ছায় তা বিসর্জন দেওয়া বা বিক্রি করার মতো মর্মস্পর্শী ব্যাখ্যা দিয়েছেন লেখক। জীবন ও জীবিকার মৌলিক প্রয়োজনের কাছে তুচ্ছ হয়েছে নারীর সোনার প্রতি সহজাত অন্ধমোহ। স্বর্ণালঙ্কার পেটের ক্ষুধা আর দারিদ্র্যের কাছে তুচ্ছ হয়েছে। ক্ষুধা ও দারিদ্র্য সকল মোহ ও সুখস্বপ্নের অন্তরায় হয়েছে। লেখক এ উপন্যাসে দেখিয়েছেন, মানুষের সর্বপেক্ষা বড় সমস্যার নাম পেটের ক্ষুধা ।

এই উপন্যাসের সাধনা ও রাখালের সাংসারিক টানাপড়েন, নিত্য অভাব ও জীবন সংগ্রামের চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা, দুর্ভিক্ষ ও দেশভাগের পূর্বের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সবমিলিয়ে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরাবস্থায় রাষ্ট্রের আর্থসামাজিক ভিতটি নড়বড়ে হয়ে পড়ে। এমন অস্থিতিশীল পরিবেশে ধর্মভিত্তিক দেশভাগের প্রভাবে আপামর জনসাধারণ তীব্রভাবে আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়। কালক্রমে দেশের অস্থিতিশীলতাকে পুঁজি করে পুঁজিবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পুঁজিকে অবলম্বন করে ধনিক শ্রেণি আরো ধনী হয়েছে অন্যদিকে ক্ষুধা নিবারণ করতে প্রতি মুহূর্তে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষের সুখ-শান্তি, বিশ্বাস, ভালোবাসার, সব কিছুতে একাকার হয়ে মিশেছে ক্ষুধার জ্বালা। ছিন্নমূল মানুষ পেয়েছে উদ্বাস্তু উপাধি । "দুর্মূল্য, খোলা-বাজার আর চোরাবাজার শুধু স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত মানুষদেরই নয়, আয় যাদের আরো অনেক বেশি তাদেরও জোরে আঘাত করেছে- মাঝারি ব্যবসায়ীরা পর্যন্ত বেসামাল হবার উপক্রম।"[৩৮] রাখাল-সাধনা, রাজিব-বাসন্তী, সঞ্জীব-আশাসহ সকল পরিবারের একই চিত্র লেখক অতি সযতনে তুলে ধরেছেন। অভাবে রাখাল

টিউশনি করে। টিউশনির অল্প টাকায় সংসারের নিত্য প্রয়োজন মেটে না। বেকার স্বামী অর্থাভাবে সংসার চালাতে অপরাগ হলে সাধনা স্বেচ্ছায় অতিপ্রিয় স্বর্ণালঙ্কার রাখালের হাতে তুলে দেয়। শুধু সাধনা নয় সাধনার মাধ্যমে বিবাহিত নারীর স্বর্ণালঙ্কার প্রীতির সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণ এবং প্রয়োজনীয়তাকে অত্যন্ত বাস্তবসম্মতভাবে এ উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। মধ্যবিত্ত জীবন যন্ত্রণার বাস্তবসম্মত বর্ণনা স্থান পেয়েছে এ উপন্যাসে।

মধ্যবিত্তের নিত্য অভাব মুখোশে আবৃত জীবনে মানিয়ে চলার প্রবণতায়, মিথ্যা অহমিকা, দম্ভ আর লোক দেখানো অহংকারে সাধনার মন বিষিয়ে উঠে । কঠিন সংকটে কলোনির নিম্নবিত্ত ভোলার মায়ের জীবনের মুখোশহীনতায় সে যেন কিছুটা স্বস্তি পায়। কেননা ভোলার মা অকপটে নিজের আর্থিক দুর্গতির বিষয় সর্বসম্মুখে স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। অন্যদিকে মধ্যবিত্ত সাধনা সত্যকে আড়াল করে রাখে। মধ্যবিত্ত মানসিকতায় সাধনার সকল অপ্রাপ্তি ও অপূর্ণতা হাহাকারকে বাহ্যিকভাবে লোকদেখানো প্রাপ্তির সুখী মুখাবয়বের অন্তরালে আচ্ছাদিত করে রাখে। এ রূপেই মধ্যবিত্ত সমাজ চলমান জীবনে তাদের সম্মান ও সম্ভ্রম বাঁচিয়ে রাখার সংগ্রামে সতর্কজীবন অতিবাহিত করে। পুঁজিবাদী সমাজের প্রভাবে প্রতারিত হয়েছে রাজীব ও সঞ্জীব। সাধনা, আশা, বাসন্তী অনুধাবন করে জগতসংসারে সোনার চেয়ে দামী জিনিস আছে। তারা স্বামীর হাতে স্বর্ণালঙ্কার তুলে দিয়েছে। অভাবে ক্রমাগত না পাওয়ার মাঝে রাখাল ও সাধনার দাম্পত্য সঙ্কটের ফাটল বৃহৎ আকার ধারণ করে। সাধনা নিজে থেকে নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টায় সামগ্রিক সত্যের মুখোমুখি হয়। কঠিনতর সংকটে সাধনা উদ্বাস্তু মানুষদের সাথে একাত্ম হয়ে যায়। উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠীর মঙ্গলার্থে; আন্দোলনে সাধনা সক্রিয় হয়। "ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে সমষ্টির স্বার্থে আত্মনিবেদনের মধ্যেই লুকিয়ে আছে মানুষের প্রকৃত মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্ব।"[৩৯] সামগ্রিক স্বার্থে অর্থাৎ সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণে সাধনা একনিষ্ঠভাবে বিদ্রোহী হয়ে উঠে। অনায়াসে রিনা উদ্বাস্তু শিবিরে মিশে যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় *সোনার চেয়ে দামি* উপন্যাসে পুঁজিপ্রথা ও তার প্রভাবে অর্থ-সামাজিক পরিবর্তন ও বিদ্রোহ দেখিয়েছেন। পাশাপাশি উপন্যাসের চরিত্রগুলোর মনস্তাত্ত্বিক সংঘাত তথা গভীর মনোবিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *হলুদ নদী সবুজবন* উপন্যাসটি ১৯৫৬ সালের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয়। মানিকের জীবদ্দশায় প্রকাশিত উপন্যাসগুলোর মধ্যে এ উপন্যাসের পরে মাত্র একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। জীবনের শেষ পর্যায়ের রচনা *হলুদ নদী সবুজবন* উপন্যাসে মানিকের লেখকসত্তা কিছুটা স্বতন্ত্র। শুধু মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা তথা চরিত্রের মনোভূমি বিচরণ নয়, এ উপন্যাসে মুখ্য হয়ে উঠেছে শ্রেণিগত জীবনের সংগ্রাম। উপন্যাসে ধনিক বুর্জোয়াশ্রেণির পাশাপাশি মানিক শ্রমিকশ্রেণিকেও স্থান দিয়েছেন। তুলনা করেছেন উভয়ের জীবনাচরণ, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ। "ঈশ্বর ও লখার মা চরিত্রের মাধ্যমে মানিক শ্রমজীবী মানুষের আত্মমর্যাদাবোধ, নিরহংকার জীবন-অভীপ্সা, ঐক্যচেতনা, পারস্পরিক মমত্ববোধ ও শোষণ-বঞ্চনাবিষয়ক সচেতন জীবনজিজ্ঞাসাকেই এ উপন্যাসে মূর্ত করে তুলেছেন। উপন্যাসটিও এদিক থেকে হয়ে উঠেছে তাৎপর্যপূর্ণ।"[৪০] *হলুদ নদী সবুজবন* উপন্যাসে সমুদ্রের কাছাকাছি জঙ্গলে ঘেরা কোন এক নদী তীরবর্তী প্রত্যন্ত এলাকাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এ গ্রামে কারখানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় অধিকাংশ মানুষের পেশা বদলে যায়। শিল্প-কারখানার প্রভাবে এ অঞ্চলে নব্য শহুরে ভাব এসেছে। এলাকার জমিদার, পুঁজিপতি মহাজন ও ইংরেজ সাহেবেরা

ধনিকশ্রেণির অন্তর্গত। অন্যদিকে শ্রমিক ও কৃষক সম্প্রদায় নিম্নশ্রেণির অন্তর্গত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এ উপন্যাসে একটি ক্লাবকে কেন্দ্র করে বুর্জোয়া পুঁজিপতিদের জীবনাচরণ ও কার্যকলাপ তুলে ধরেছেন। উভয় শ্রেণির মাঝে বৈপরীত্যকে প্রকাশ করেছেন। জঙ্গলঘেরা গ্রামটিতে বাঘের আক্রমণ নিত্য ঘটনা। গ্রামবাসীরা জীবন বাঁচানোর প্রয়োজনে দলবেঁধে বাঘ শিকার করতে যেত। অন্যদিকে ধনিক শ্রেণির বাঘ শিকার আয়োজন ছিল নিতান্তই শখের বশে। নিজের শক্তি ও বীরত্ব প্রমাণ করার জন্য ধনীকশ্রেণির বাঘ শিকারের বিলাসী আয়োজন; গ্রামবাসীদের মধ্যে দক্ষ বাঘ শিকারিকে তারা সঙ্গে নিত।

এই উপন্যাসে ঈশ্বর সর্বপেক্ষা সাহসী ও শক্তিশালী বাঘ শিকারী। শ্বেতাঙ্গ পুঁজিপতি রবার্টসন ও দেশি জমিদার প্রভাস শখের বশে ঈশ্বরকে সঙ্গী করে বাঘ শিকারে যায়। ঈশ্বর একাই দুইটা বাঘ শিকার করে কিন্তু বীরত্ব প্রকাশের সাহস পায় না। পুঁজিবাদী সমাজের পুঁজির দৌরাত্ম্যে অভাবী শ্রমিক ঈশ্বরের বীরত্ব চাপা পড়ে। রবার্টসন ও প্রভাস অর্থের বিনিময়ে ঈশ্বরের মুখ বন্ধ করে। তারা উভয়েই নিজেদের বীরত্ব প্রকাশ করতে গিয়ে নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে যায়। স্ত্রীর চিকিৎসার প্রয়োজনে ঈশ্বর দুজনের কাছে থেকেই টাকা নেওয়ায় সে ইংরেজ ও দেশীয় জমিদার দুজনেরই ক্রোধের শিকার হয়। পরিণামে শারীরিক নির্যাতনসহ কারখানা থেকে চাকুরিচ্যুত হয়। শ্রমিক বিদ্রোহের আশঙ্কায় শঙ্কিত মালিকপক্ষ ঈশ্বরের চাকুরী ফিরিয়ে দেয়। শ্রমিকের ঘাম শোষণ করে মালিক শ্রেণি হয়ে উঠেছে বুর্জোয়া। শ্রমিকদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ইমারত গড়ে উঠলেও তাদের অর্জিত সামান্য বেতনে পেটের ক্ষুধাই মেটে না। সুচিকিৎসা অকল্পনীয় বিষয়। শ্রমিকদের প্রকাশ্য বিদ্রোহ এবং এ বিদ্রোহের মুখে বণিকশ্রেণির নতিস্বীকার এবং তাদের দাবি মেনে নেওয়ার মধ্য দিয়ে এ উপন্যাসে মার্কসীয় শ্রেণিচেতনা দৃঢ়ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। লখার মা এ উপন্যাসের প্রতিবাদী, অসীম প্রাণশক্তির আধার, অনন্য এক সংগ্রামী নারীচরিত্র। জীবিকার পথ সুগম করার জন্য লখার মা পুঁজিপতির লালসায় নিজেকে বিসর্জন দেয় না। ছোট ছোট প্রচেষ্টায় হয়ে ওঠে জনপ্রিয় গল্পকথক। বুদ্ধি করে গল্পের সাথে জুড়ে দেয় গান। গল্পগানে পাড়াময় নাম ছড়ালে ধনীদের গৃহে ডাক পড়ে লখার মায়ের। আত্মমর্যাদাশীল লখার মা হয়ে ওঠে পেশাদার গল্প গীতিকার। এই উপন্যাসে পাশাপাশি দুটো শ্রেণিকে উপস্থাপন করে লেখক উভয় শ্রেণির শিক্ষা-সংস্কৃতি, কৃষ্টি কালচার, রীতি ও আচারের তুলনা দেখিয়েছেন। বিত্তশালীদের সংস্কৃতি ও আচারের তুলনায় বৃত্তহীনদের জীবনাচরণের তুলনামূলক শুভ্র-সুন্দর দিকটি প্রকাশিত হয়েছে। "অন্যদিকে মধ্যবিত্তের অন্তর্গত ক্লেদ বা ক্ষমতাকে উন্মোচন করার মধ্যেই মধ্যবিত্ত মনের সুস্থতা নিহিত বলে প্রথম পর্বে ভেবেছেন মানিক।"[৪১] মানিকের প্রথম পর্বের রচনায় ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ এবং লিবিডো চেতনার প্রবল প্রকাশ ঘটেছে। "ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব, অস্তিত্ববাদ অথবা মার্কসবাদ -যে মতবাদেই মানিক আস্থাশীল হোন না কেন, তাঁর সে আস্থা কখনো অন্ধ অনুস্মৃতিতে পর্যবসিত হয়নি। যেমন কল্লোল যুগের লেখক হয়েও তিনি আর সব কল্লোলীয় লেখকের মতো ছিলেন না; তেমনি নির্দিষ্ট কোন মতবাদের কাছে চূড়ান্তভাবে আত্মসমর্পণও করেননি তিনি।"[৪২] মার্কসীয় দীক্ষায় দীক্ষিত হওয়ার পর রাজনৈতিক চেতনা সমৃদ্ধ যে উপন্যাসগুলো তিনি রচনা করেছেন তাতে মার্কসিজম প্রাধান্য পেয়েছে। "তিনি ফ্রয়েড এবং অতঃপর মার্কসকে অবলম্বন করেছিলেন এর কোনটার জন্যই তাঁকে নিন্দিত বা নন্দিত না করে আমাদের দেখা দরকার যে, মানিকবাবু জীবন থেকে কী 'নির্বাচন' করেছেন, কোন বক্তব্যে পৌঁছাতে চেয়েছেন-স্থূল কথায় তাঁর জীবনকে দেখার

মনোভঙ্গি কী।"[৪৩] মার্কসবাদী দীক্ষা নেওয়ার পূর্বের উপন্যাসগুলোতে ব্যক্তিচেতনা থাকলেও প্রকৃতপক্ষে মার্কসীয় শ্রেণিচেতনা বলতে যা বোঝায় তা প্রথম পর্বের উপন্যাসে অনুপস্থিত। দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাসে মার্কসবাদীচেতনা ও রাজনৈতিক আবহের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে উপন্যাসের চরিত্রগুলোর মনঃসমীক্ষণ।

বাংলা সাহিত্যের মধ্যবিত্ত মানুষের বাস্তব জীবন চিত্রায়ণে মানিক বন্দোপাধ্যায় এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথাসাহিত্যিক। তিনি দ্বিতীয় পর্বের রচনায় অনুধাবন করেছিলেন চরিত্রের পূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা- লিবিডোর প্রভাব আর তার অস্তিত্বের সংগ্রামকে উপেক্ষা করে বিকশিত হয় না। প্রকৃতপক্ষে জীবনের সত্যচিত্রই উপন্যাসের কাহিনি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে মধ্যবিত্ত সমাজের বাস্তব জীবনযন্ত্রণার প্রকাশ লক্ষণীয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাস সৃষ্টিতে এক অনবদ্য সফল শিল্পী।

তথ্যসূচি:

---

১ ড. নিতাই বসু, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজ জিজ্ঞাসা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ৫৬
২ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, অষ্টম সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ১৫
৩ সৈয়দ আজিজুল হক, *কথাশিল্পী মানিক*, কথা প্রকাশ, ঢাকা, ২০২০, পৃ. ১৭
৪ তদেব, পৃ. ২০
৫ শ্রী শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, বিভাস প্রকাশন, ঢাকা, ২০২০, পৃ. ৫৪৭
৬ সৈয়দ আজিজুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩
৭ হায়াৎ মামুদ (সম্পা), *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, অবসর প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ১৪২
৮ তদেব, পৃ. ১৪২
৯ শ্রী শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৩
১০ হায়াৎ মামুদ (সম্পা), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪
১১ অনুপম হাসান (সম্পা), *সাহিত্যতত্ত্বের ধারা ও সাহিত্য সমালোচনা পদ্ধতি*, বুকস ফেয়ার, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ২৮৫
১২ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪
১৩ হায়াৎ মামুদ (সম্পা), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪
১৪ তদেব, পৃ. ২৪৪
১৫ তদেব, পৃ. ৩০৮
১৬ শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৪৩
১৭ ভূইয়া ইকবাল (সম্পা), *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, দ্বিতীয় সংস্করণ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ২২৭, ২২৮
১৮ হায়াৎ মামুদ (সম্পা), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৬
১৯ শ্রী শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৫
২০ হায়াৎ মামুদ (সম্পা), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৯
২১ সৈয়দ আজিজুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮
২২ তদেব, পৃ. ৭৬
২৩ তরুণ মুখোপাধ্যায় (সম্পা), *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্রোহী প্রমিথিউস*, তুলসী প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ২০৪
২৪ সৈয়দ আজিজুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬
২৫ হায়াৎ মামুদ (সম্পা), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৯
২৬ শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৬

[২৭] ড. নিতাই বসু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮
[২৮] সৈয়দ আজিজুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭
[২৯] তদেব, পৃ: ১৪৬
[৩০] তদেব, পৃ. ১৪৮
[৩১] তরুণ মুখোপাধ্যায় (সম্পা), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫
[৩২] নিতাই বসু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩
[৩৩] হায়াৎ মামুদ (সম্পা), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৯
[৩৪] সৈয়দ আজিজুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০
[৩৫] তরুণ মুখোপাধ্যায় (সম্পা), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯
[৩৬] সৈয়দ আজিজুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭
[৩৭] তদেব, পৃ. ২১৯
[৩৮] ড. নিতাই বসু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬
[৩৯] সৈয়দ আজিজুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪
[৪০] তদেব, পৃ. ৩৫৭
[৪১] তদেব, পৃ. ২৯১
[৪২] সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২
[৪৩] ড. উপল তালুকদার, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে ফ্রয়েডীয় প্রভাব*, অনার্য প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ৪০